بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ নভেম্বর, ২০২২ মোতাবেক ১১ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। তাঁর জীবনচরিতের কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছিল। এ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত আছে তাতে এটিও রয়েছে যে, তিনি বংশানুক্রমের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং কাব্যানুরাগীও ছিলেন। লেখা আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আরবদের বংশানুক্রমের জ্ঞান রাখতেন। জুবায়ের বিন মুত'ইম, যিনি এ বিদ্যায় অর্থাৎ বংশতত্ত্ব বিদ্যায় পরম দক্ষতা রাখতেন, তিনি বলেন, আমি বংশানুক্রমের জ্ঞান হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে শিখেছি, কেননা কুরাইশদের মধ্য হতে বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশদের বংশবৃক্ষে যেসব ভালোমন্দ ছিল সে সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু তিনি তাদের মন্দ বিষয়াবলীর উল্লেখ করতেন না; একারণে তিনি হযরত আকীল বিন আবু তালিব-এর তুলনায় তাদের কাছে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ কুরাইশদের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র পরে হযরত আকীল কুরাইশ বংশের বংশানুক্রম, তাদের পূর্বপুরুষ এবং তাদের ভালোমন্দ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন। কিন্তু হযরত আকীল কুরাইশের কাছে অপছন্দীয় ছিলেন, কেননা তিনি কুরাইশদের মন্দ বিষয়গুলোও তুলে ধরতেন। হযরত আকীল মসজিদে নববীতে বংশপরিচয় এবং আরবদের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে বসতেন। মক্কাবাসীর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। অতএব, কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেই তারা তাঁর কাছে সাহায্য চাইতো। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.)'র আরব বংশানুক্রম বিশেষভাবে কুরাইশ বংশানুক্রমের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি ছিল। কুরাইশের কবিরা যখন মহানবী (সা.)-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখে তখন হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)'র ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে, তিনি যেন কবিতাতেই তাদের ব্যঙ্গের উত্তর দেন। হযরত হাসসান যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কুরাইশদের দোষত্রুটি কীভাবে তুলে ধরবে যেখানে আমি নিজেও কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত? তখন হযরত হাসসান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনাকে এদের মধ্য থেকে সেভাবে বের করে আনবো যেভাবে আটা থেকে চুল কিংবা মাখনের মধ্য থেকে চুল বের করে নেয়া হয়। এরপর মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি হযরত আবু বকরের কাছে যাও এবং তার কাছ থেকে কুরাইশদের বংশধারা জেনে নিও। হযরত হাসসান বলতেন, এরপর থেকে আমি কবিতা লেখার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হতাম এবং তিনি আমাকে কুরাইশদের পুরুষ ও মহিলাদের সম্পর্কে নির্দেশনা দিতেন। অতএব, হযরত হাসসান (রা.)'র কবিতা যখন মক্কায় পৌঁছত তখন মক্কাবাসী বলতো, এসব কবিতার পেছনে (অবশ্যই) আবু বকরের নির্দেশনা ও পরামর্শ রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বংশানুক্রম বিশারদ হওয়ার পাশাপাশি **আইয়্যামে আরব** অর্থাৎ আরবদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস বিষয়ক অনেক বড় পণ্ডিতও ছিলেন। একইভাবে হযরত আবু

বকর (রা.) যথারীতি কবি না হলেও কবিতার উন্নত রুচিবোধ রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবনীকারগণ এই বিতর্কের অবতারণা করেছেন যে, তিনি রীতিমতো কবিতা রচনা করেছেন কিনা? কোন কোন জীবনীকার অবশ্য তাঁর কবিতা রচনার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, কিন্তু কতক জীবনীকার হযরত আবু বকর (রা.)'র কিছু কবিতার কথা উল্লেখও করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.)'র কবিতা অর্থাৎ পঁচিশটি কবিতা সম্বলিত একটি পুস্তিকা– যা তুরস্কের একটি গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে, সেখানে সংরক্ষিত আছে। বলা হয় যে, (এই) পঙক্তিগুলো হযরত আবু বকর (রা.)'র রচিত। এতে জনৈক লেখক এটিও লিখেছেন যে, ইলহামে আমার কাছে একথার সত্যায়ন করা হয়েছে যে, এই কবিতাগুলো হযরত আবু বকরের সাথে সম্পৃক্ত। তাবাকাত ইবনে সা'দ এবং সীরাত ইবনে হিশামও এটিই লিখেছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে তাঁর দাফন-কার্য সম্পন্ন হবার পর হযরত আবু বকর (রা.) কবিতার এই পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয় যার অনুবাদ হলো,

হে চোখ! তোমায় দো-জাহানের নেতা (সা.)-এর জন্য অশ্রুবিসর্জনের অধিকারের কসম! তুমি কাঁদতে থাকো এবং তোমার অশ্রুধারা যেন কখনো না থামে। হে চোখ! খিনদিফ [অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের] সর্বোত্তম সন্তানের জন্য অশ্রু প্রবাহিত কর, যাঁকে সন্ধ্যায় কবরে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। অতএব, তাঁর (সা.) প্রতি বাদশাহ্‌দেরও বাদশাহ্‌, বান্দাদের অধিপতি এবং ইবাদতকারীদের প্রতিপালকের দরূদ বর্ষিত হোক। প্রিয়তমের বিরহে এই জীবন অর্থহীন! দশ-জাহানের সৌন্দর্য বর্ধনকারী সত্তার বিচ্ছেদের পর এখন আবার কিসের সজ্জা! অতএব, আমরা সবাই যেভাবে পৃথিবীতে এক সাথে ছিলাম, হায়! মৃত্যুও যদি আমাদের সবাইকে একসাথে আলিঙ্গন করতো!

এই হলো পঙক্তিগুলোর অনুবাদ। তাঁর (রা.) বিচক্ষণতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, (তিনি) অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর) এক বান্দাকে এই জগত অথবা আল্লাহ্ তা'লার নিকট যা আছে তা (গ্রহণের) অধিকার প্রদান করেছেন। তখন সে যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট আছে তা পছন্দ করেছে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন আমি মনে মনে বলি, কোন কথা এই বুযুর্গকে কাঁদাচ্ছে? যদি আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর এক) বান্দাকে পৃথিবী অথবা যা তাঁর নিকট আছে তা পছন্দ করার সুযোগ প্রদান করেন, তাহলে সে যা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার নিকট আছে- তা পছন্দ করেছে। মহানবী (সা.)-ই সেই বান্দা ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। এরপর রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি (সা.) বলেন, আবু বকর! কেঁদো না। নিশ্চয় আবু বকরই সব মানুষের মধ্যে স্বীয় সাহচর্য ও ধন-সম্পদ দ্বারা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি পুণ্য করেছেন। যদি আমি আমার উম্মতের কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই (বন্ধু হিসেবে) গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের সম্পর্ক ও ভালোবাসাটাই বড়। আবু বকরের দরজা ব্যতিরেকে মসজিদের সকল দরজা যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। (তার) বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে এই উদ্ধৃতি পুনরায় উপস্থাপন করেছি, পূর্বেও বলেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দরজা সম্পর্কেও একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন

যা পরে বর্ণনা করবো। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

যখন মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি (সা.) একদিন বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হন এবং সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লার এক বান্দা রয়েছে। তাকে তার খোদা সম্বোধন করে বলেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে অধিকার দিচ্ছি- তুমি চাইলে পৃথিবীতে থাকতে পারো, অথবা আমার কাছে ফিরে এসো। তখন সেই বান্দা খোদার নৈকট্যকে পছন্দ করেন। মহানবী (সা.) যখন একথা বলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। [এখানে হযরত উমরের বরাতে কথা হচ্ছে;] হযরত উমর (রা.) বলেন, তাঁর এই কান্না দেখে আমার খুব রাগ হয় যে, মহানবী (সা.) তো কোন এক বান্দার কথা বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে অধিকার দিয়েছেন, যদি সে চায় তবে পৃথিবীতে থাকতে পারে, আর চাইলে খোদা তা'লার নিকট যেতে পারে; সে খোদা তা'লার নৈকট্যকে পছন্দ করেছে। (এতে) এই বৃদ্ধ কাঁদছে কেন? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে কাঁদতে এত বেশি ফোঁপাচ্ছিলেন যে তা বন্ধই হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি (সা.) বলেন, আবু বকরের প্রতি আমার এতটা ভালোবাসা রয়েছে যে, খোদা ব্যতিরেকে অন্য কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো বৈধ হতো তাহলে আমি আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম। হযরত উমর বলেন, মহানবী (সা.) যখন কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আবু বকরের ক্রন্দন যথার্থ ছিল, আর আমাদের রাগ নির্বুদ্ধিতার লক্ষ্মণ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.), যিনি পবিত্র কুরআনের এমন জ্ঞান লাভ করেছিলেন যে, যখন মহানবী (সা.) আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ পাঠ করেন তখন হযরত আবু বকর কেঁদে ফেলেন। কেউ জিজ্ঞেস করে, এই বৃদ্ধ কেন কাঁদছে? তখন তিনি বলেন, আমি এই আয়াত দ্বারা, অর্থাৎ হযরত আবু বকর বলেন যে, আমি এই আয়াত থেকে খোদার নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর তিরোধানের আভাস পাচ্ছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নবীগণ (আ.) শাসকের ন্যায় হয়ে থাকেন। যেভাবে সেটেলমেন্ট কর্মচারী নিজের কাজ শেষ করার পর সেখান থেকে বিদায় নেয়, অনুরূপভাবে নবীগণ (আ.) যে কাজের জন্য পৃথিবীতে আসেন, তা সম্পন্ন করার পর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। অতএব যখন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর ডাক আসে তখন হযরত আবু বকর বুঝে যান যে, এটি হলো অন্তিম ডাক। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকরের বোধবুদ্ধি অনেক উন্নত মানের ছিল। আর হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদমুখী সব জানালা বন্ধ করে দেয়া হোক; [এই জানালার ব্যাখ্যাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদান করেছেন যে এর অর্থ কী;] তিনি বলেন, হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদমুখী সব জানালা যেন বন্ধ করে দেয়া হয়, কিন্তু আবু বকরের জানালা মসজিদের দিকে খোলা থাকবে– এর রহস্য হলো, মসজিদ যেহেতু ঐশী রহস্যাবলীর প্রকাশস্থল হয়ে থাকে, তাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র প্রতি এই দ্বার বন্ধ হবে না। ঐশী রহস্যাবলী, সুপ্ত বিষয়াবলী, আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে যে গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে– সেগুলো হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র ক্ষেত্রে সর্বদা খোলা থাকবে আর পরবর্তীতেও উন্মোচিত হতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নবীগণ (আ.) উপমা ও রূপকের ব্যবহার করে থাকেন। যে ব্যক্তি বাহ্যিকতার পূজারী মোল্লাদের ন্যায় এই কথা বলে যে, বাহ্যিকতাই সব কিছু, সে মারাত্মক ভুল করে। উদাহরণস্বরূপ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিজ পুত্রকে এই কথা

বলা যে, এই চৌকাঠ পরিবর্তন কর, অথবা মহানবী (সা.)-এর স্বর্ণের কঙ্কণ দেখা ইত্যাদি বিষয় বাহ্যিক অর্থে ছিল না, বরং রূপকস্বরূপ ছিল। সেগুলোর মাঝে ভিন্ন তত্ত্ব অন্তর্নিহিত ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বস্তুত মূল বিষয় হলো, হযরত আবু বকরকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি দান করা হয়েছিল। তাই হযরত আবু বকর এই ব্যাখ্যা করেন। আমার বিশ্বাস হলো, এসব অর্থ যদি বাহ্যত বাস্তবতার পরিপন্থী হতোও, তাহলেও তাকওয়া ও সততার দাবি এটিই ছিল যে (মানুষ) আবু বকরের কথা মেনে নেবে। [অর্থাৎ মানুষ তাঁরই কথা মানত।] কিন্তু এখানে তো পবিত্র কুরআনে একটি শব্দও এমন নেই যা হযরত আবু বকরের কৃত অর্থের পরিপন্থী। তিনি বলেন, মৌলবিদের জিজ্ঞেস করো যে, আবু বকর প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিমান ছিলেন কি না। তিনি কি সেই আবু বকর ছিলেন না যিনি সিদ্দীক অভিহিত হয়েছেন? তিনিই কি সেই ব্যক্তি নন যিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর প্রথম খলীফা হয়েছেন? যিনি ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছেন, অর্থাৎ ভয়াবহ ধর্মত্যাগের মহামারীকে প্রতিহত করেছেন? তিনি বলেন, বাকি কথা না হয় বাদ দিলাম, শুধু এতটুকু বল যে, হযরত আবু বকরের মিম্বরে চড়ার প্রয়োজন কেন দেখা দিল? অতঃপর তাকওয়ার সাথে বলো, তিনি যে, مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ পাঠ করেন, এর দ্বারা পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা উদ্দেশ্য ছিল, নাকি এমন ত্রুটিপূর্ণ দলীল দেয়া যেক্ষেত্রে এক শিশুও বলতে পারত যে, ঈসাকে যে মৃত মনে করে সে কাফের হয়ে যায়? অর্থাৎ এই আয়াতটি পড়ার উদ্দেশ্যই ছিল একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা, দুর্বল যুক্তি (উপস্থাপন) উদ্দেশ্য ছিল না।

পুনরায় অপর এক স্থানে এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ আয়াতটির দু'টি তাৎপর্য রয়েছে। একটি হলো, তোমাদের পবিত্রকরণ সুসম্পন্ন করেছেন; দ্বিতীয়ত, ঐশীগ্রন্থ সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন। কেউ একজন বলে, হে বৃদ্ধ! কাঁদছ কেন? তিনি উত্তর দেন, এই আয়াত থেকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর আভাস পাওয়া যায়; কেননা এটি জানা কথা, যখন কাজ শেষ হয়ে যায় তখন সেটির সুসম্পন্নতাই মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে। যেভাবে পৃথিবীতে সেটেলমন্টের কাজ করা হয়ে থাকে; যখন (কোন এলাকায়) তা সম্পন্ন হয়ে যায় কর্মকর্তাগণ সেখান থেকে চলে যায়। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.) সংক্রান্ত ঘটনা শোনেন তখন বলেন, আবু বকর সবচেয়ে বুদ্ধিমান; সেইসাথে বলেন, পৃথিবীতে যদি কাউকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে সে হতো আবু বকর। তিনি (সা.) আরও বলেন, আবু বকরের জানালা মসজিদ অভিমুখে খোলা থাকবে, বাকি সব বন্ধ করে দাও। কেউ (যদি) জানতে চাও যে, এর তাৎপর্য কী, একথা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে; [অর্থাৎ তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, আবার তার জানালা খোলা থাকবে– এর অর্থ কী, সেটির তাৎপর্য বর্ণনা করছেন;] তিনি বলেন, মনে রেখো, মসজিদ হলো খোদার ঘর যা সকল (ঐশী) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস। এজন্যই বলেছেন, আবু বকরের হৃদয়ের জানালা যেহেতু এদিকে, তাই মসজিদের জানালাও তার জন্য খোলা রাখা হোক। বিষয়টি এমন নয় যে, অন্য সাহাবীরা এথেকে বঞ্চিত ছিলেন; [তাদের মধ্যেও অনেক বড় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছিল হযরত আবু বকরের মাঝে;] বরং হযরত আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেই ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা যা সূচনাতেও এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং সমাপ্তিতেও; যেন আবু বকরের সত্তা দু'টি প্রজ্ঞার সমাহার ছিল।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক জটিল বিষয় ও সেগুলোর কঠোরতা অবলোকন করেছেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও রণকৌশল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বহু মরু ও পর্বতমালা অতিক্রম করেছেন। বহু বিপদসংকুল স্থান ছিল যেখানে তিনি নির্দ্বিধায় প্রবেশ করেছেন এবং কতশত বক্র পথ ছিল যেগুলোকে তিনি সোজা করেছেন; অনেক যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কতই না নৈরাজ্যকে তিনি নিশ্চিহ্ন করেছেন ও বহু বাহনকে তিনি সফর করতে করতে দুর্বল করে দিয়েছেন; [অর্থাৎ অসংখ্য সফর করেছেন, যার ফলে বাহনগুলো ক্লান্ত হয়ে যেতো]; তিনি অনেক অনেক গন্তব্যে সফলভাবে পৌঁছেছেন। এভাবে এগোতে এগোতে তিনি বিচক্ষণ হয়ে গিয়েছেন। তিনি বিপদাপদে ধৈর্যশীল ও সাধনাকারী ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে স্বীয় বাণীর অবতরণস্থল মহানবী (সা.)-এর সহচর হবার জন্য বেছে নেন এবং তাঁর সততা ও অবিচলতার কারণে তাঁর প্রশংসা করেন। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রিয়দের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট ছিলেন এবং বিশ্বস্ততা তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। এজন্য তাঁকে ভয়ানক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার মত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সময় নির্বাচন করা হয়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাবান; তিনি যাবতীয় বিষয় যথাসময়ে ও যথাস্থানে সংঘটিত করেন এবং পানিকে উপযুক্ত উৎস থেকে উৎসারিত করেন। অতএব তিনি আবু কোহাফার পুত্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন এবং তাঁকে এজগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যিনি সবচেয়ে বড় সত্যবাদী, তিনি বলেছেন:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ
سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ তোমরা যদি এই রসূলকে সাহায্য না-ও কর তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ইতোপূর্বেও তাকে সাহায্য করেছেন যখন সেসব লোক, যারা অস্বীকার করেছে, তারা তাকে দেশান্তরিত করেছিল এমাতাবস্থায় যে, সে দু'জনের একজন ছিলেন। যখন তারা উভয়ে গুহায় অবস্থান করছিল এবং সে তার সাথিকে বলছিল, দুঃখ করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তাকে প্রশান্তি দান করেন এবং তাকে এমন সব সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন যাদেরকে তোমরা কখনোই দেখ নি। আর তিনি তাদের কথা হেয় সাব্যস্ত করেছেন যারা অস্বীকার করেছিল। এছাড়া (জেনে রেখো) আল্লাহ্র বাণীই সর্বদা বিজয়ী হয়, আর আল্লাহ্ পূর্ণ বিজয়ের অধিকারী এবং পরম প্রজ্ঞাময়।

হযরত আবু বকর (রা.) স্বপ্নের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও খুবই পারদর্শী ছিলেন। লেখা আছে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র বিশেষ দক্ষতা ছিল। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি সবার ঊর্ধ্বে ছিলেন। এমনকি তিনি সমগ্র জাহানের নেতা মহানবী (সা.)-এর যুগেও স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সবচেয়ে বড় স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণিত কয়েকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এখন উল্লেখ করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করে, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! স্বপ্নে আমি একটি মেঘ দেখেছি যা থেকে ঘি এবং মধু বর্ষিত হচ্ছিল। আমি দেখি, মানুষ তা নিজেদের হাতে নিচ্ছিল; কেউ বেশি নিচ্ছিল আর কেউ কম নিচ্ছিল। এছাড়া আমি একটি রশি দেখি যা আকাশ থেকে ঝুলছিল, আর আমি আপনাকে (সা.) দেখি যে, আপনি সেটি ধরে উপরে চলে যান। এরপর আরেক ব্যক্তি সেটি ধরেন এবং তিনিও তা ধরে উপরে চলে যান, তারপর অন্য আরেক ব্যক্তিও তা ধরে উপরে চলে যান। অতঃপর আরেক ব্যক্তি সেটি ধরলে তা ছিঁড়ে যায়, পরে তার জন্য তা জোড়া লাগিয়ে দিলে তিনিও সেটি দ্বারা উপরে উঠে যান।** হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমাকে এর ব্যাখ্যা করার অনুমতি দান করুন; অনুমতি দিলে আমি এর ব্যাখ্যা করব। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, ব্যাখ্যা কর। **তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ছায়া দানকারী মেঘ হলো ইসলাম, আর তা থেকে যে মধু ও ঘি বর্ষিত হচ্ছিল তা পবিত্র কুরআন এবং এর মাধুর্য ও এর সৌন্দর্য। এছাড়া মানুষ যে সেখান থেকে ঘি নিচ্ছে– এর অর্থ হলো কুরআন লাভকারী, অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অধিক বা অল্প জ্ঞান লাভকারী। আর আকাশ থেকে ঝুলন্ত রশি হলো সত্য যার ওপর আপনি (সা.) প্রতিষ্ঠিত আছেন। আপনি (সা.) এর দ্বারা সুউচ্চ মর্যদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আপনার (সা.) পর একে অন্য একজন নেবে এবং এর মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। আবার আরেকজন (নেবে) এবং সে-ও এর মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। পুনরায় অন্য আরেকজন (নেবে) কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে, তবে তার জন্য তা জোড়া দেয়া হবে, আর এরপর সে এর মাধ্যমে উচ্চকিত হবে।** মহানবী (সা.) বলেন, **তুমি কিছু ঠিক বলেছ ও কিছু ভুল করেছ।** হযরত আবু বকর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকে কসম দিচ্ছি, আপনি আমার ব্যাখ্যার সঠিক ও ভ্রান্ত দিকগুলো অবশ্যই আমাকে বলুন। মহানবী (সা.) বলেন, **আবু বকর, কসম দিও না!** [অর্থাৎ তিনি চাইছিলেন না যে, এর সঠিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ঐ মুহূর্তে বলে দেয়া হোক। তাই তিনি বলেন, কসম দিও না; ঠিক আছে, যতটা তুমি করেছ তা-ই যথেষ্ট।] ইবনে শিহাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্নটি তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সামনে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আর আমি যেন একটি সিঁড়িতে আরোহণ করেছি আর আমি তোমার চেয়ে আড়াই সিঁড়ি সামনে অগ্রসর হয়েছি। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ভালো দেখেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে ততদিন পর্যন্ত জীবিত রাখবেন যতদিন না আপনি স্বচক্ষে সেই বিষয় দেখেন যা আপনাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করবে এবং আপনার চোখ স্নিগ্ধ হবে। তিনি তাঁর সামনে একথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তৃতীয়বার বললেন, হে আবু বকর! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি আর তুমি একটি সিঁড়িতে আরোহণ করেছি আর আমি তোমার চেয়ে আড়াই সিঁড়ি উপরে উঠেছি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে নিজ দয়া এবং মাগফিরাতের দিকে নিয়ে যাবেন, আর আমি আপনার পর আড়াই বছর পর্যন্ত জীবিত থাকব। বস্তুত এমনটিই হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে নিজের কামরায় তিনটি চাঁদ পড়তে দেখি। তখন আমি আমার এ স্বপ্ন আমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র কাছে বর্ণনা করি। যখন মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর দাফনকার্য হযরত আয়েশার কামরায় সম্পন্ন করা হলো, তখন হযরত আবু বকর তাকে বললেন, এটি তোমার ঐ চাঁদগুলোর মাঝে একটি এবং এটি সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমি দেখেছি কালো ছাগলের পাল আমার অনুসরণ করছে এবং সেগুলোর পেছনে ধূসর রংয়ের ছাগলের পাল রয়েছে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই আরববাসীরা আপনার অনুসরণ করবে, এরপর অনারবরা তাদের অনুসরণ করবে। মহানবী (সা.) বলেন, ফিরিশ্‌তাও এই ব্যাখ্যাই করেছেন। এগুলো ছিল স্বপ্নের উল্লেখ।

এখন আলোচনা করা হবে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান কে ছিলেন? এ সম্পর্কে এটিই বলা হয়ে থাকে যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)ই ছিলেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-কে সেই প্রাথমিক যুগে দেখেছি যখন তাঁর সাথে কেবলমাত্র পাঁচজন দাস, দু'জন মহিলা এবং হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তার সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বিস্তারিত নোট লিখেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী কে? এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেন, মহানবী (সা.) নিজ মিশনের প্রচার শুরু করলে সর্বপ্রথম ঈমান আনেন হযরত খাদিজা (রা.), যিনি এক মুহূর্তের তরেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিপতিত হন নি। হযরত খাদিজা (রা.)'র পর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী পুরুষ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কোহাফার কথা বলেছেন, কতক হযরত আলীর নাম উল্লেখ করেছেন যার বয়স সেই সময়ে কেবলমাত্র দশ বছর ছিল এবং কেউ কেউ মহানবী (সা.)-এর মুক্তকৃত দাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার কথা বলেন। কিন্তু আমার মতে এই বিতর্ক অনর্থক। হযরত আলী এবং যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ঘরের লোক ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের ন্যায় তাঁর সাথে থাকতেন। মহানবী (সা.) বলামাত্র তারা ঈমান এনেছেন। [অর্থাৎ, মহানবী (সা.) যা বলেছেন তার ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল এবং ঈমান ছিল। তাদের একথা বলা যে, আমরা ঈমান এনেছি– এটি এমন কোন বিষয় নয়, কেননা তাদের বয়স কম ছিল এবং তারা বাড়ির লোক ছিলেন।] বরং তাদের পক্ষ থেকে হয়তো কোন মৌখিক স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন ছিল না। কাজেই, তাদের নাম এর মাঝে টেনে আনার কোন প্রয়োজন নেই। আর অবশিষ্ট সবার মাঝে সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর (রা.) অগ্রগণ্য এবং ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ভদ্রতা ও যোগ্যতার কারণে কুরাইশদের মাঝে খুবই সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইসলামে তিনি সেই মর্যাদা লাভ করেছেন যা অন্য কোন সাহাবীর ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এক মুহূর্তের জন্যও মহানবী (সা.)-এর দাবীর বিষয়ে সন্দেহ করেন নি।

বরং শোনামাত্রই গ্রহণ করেছেন এবং সেই সাথে তিনি তার পুরো মন ও প্রাণ এবং ধন-সম্পদ মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তিনি তাঁর প্রথম খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে অতুলনীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে ইউরোপের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্প্রিঙ্গার লিখেছে,

ইসলামের সূচনালগ্নে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আবু বকর (রা.)'র ঈমান আনয়ন করা এ বিষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, মুহাম্মদ (সা.) ধোঁকার শিকার হলেও হতে পারেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ধোঁকা দানকারী ছিলেন না। বরং সত্য অন্তঃকরণে নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে বিশ্বাস করতেন।

স্প্রিঙ্গারের এ মতের সাথে স্যার উইলিয়াম মুইরও সম্পূর্ণ একমত।

হযরত খাদিজা হযরত, আবু বকর, হযরত আলী এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসার পর ইসলাম গ্রহণকারী এমন পাঁচজন লোক ছিলেন যারা হযরত আবু বকর (রা.)'র তবলীগে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। এরা সবাই ইসলামের ইতিহাসে এমন বিশিষ্ট ও উন্নত মর্যাদার সাহাবী সাব্যস্ত হয়েছেন যে, এদেরকে শীর্ষস্থানীয় সাহাবী হিসাবে গণ্য করা হতো। এদের নাম হলোঃ প্রথম হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান, দ্বিতীয় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, তৃতীয় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, চতুর্থ হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এবং পঞ্চম হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ। এ পাঁচজন সাহাবীই আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে মহানবী (সা.) নিজ পবিত্র মুখে বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন; আর এরা সবাই তাঁর একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী এবং উপদেষ্টা হিসাবে গণ্য হতেন।

হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) একবার জামা'তের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করছিলেন; এই বিষয়টিকে তিনি এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ উপলক্ষে তিনি বলেন,

মুমিন এমন সব তাহরীকে, অর্থাৎ বিভিন্ন আর্থিক তাহরীক বা মালী কুরবানীর তাহরীকে বিচলিত হয় না বরং আনন্দিত হয়, এবং সে গর্ববোধ করে যে, তাহরীকটি সর্বপ্রথম আমার কাছে পৌঁছেছে। সে ভীত হয় না বরং সে গর্বিত হয়, আর খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় সবচেয়ে বেশি কুরবানী করে, আর এজন্য মর্যাদাও সবচেয়ে বেশি পায়। কেউ কি বলতে পারে, যেসব কুরবানী হযরত আবু বকর (রা.) করেছেন বা যে সেবা করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন, তিনি কি ভাবতেন যে, আমি কেন সর্বাগ্রে এসব কুরবানী করার সুযোগ নেবো? কখনো ভেবে থাকবেন বা আশা করে থাকবেন যে, কেন আমি সুযোগ পেলাম? তিনি (রা.) অত্যন্ত আনন্দের সাথে নিজেকে বিপদাপদে নিপতিত করেছেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছেন। এজন্য তিনি সেই মর্যাদা লাভ করেছেন যা হযরত উমর (রা.)-ও পান নি। কেননা, যে প্রথমে ঈমান আনয়ন করে সে সবার আগে কুরবানী করার সুযোগ পায়। অথচ বিপদাপদ হযরত

উমর (রা.)'র ঈমান আনয়নের সময়ও ছিল। তখনও নির্যাতন-নিপীড়ন করা হতো, নামায পড়তে দেয়া হতো না এবং সাহাবীরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছিলেন। হাবশায় প্রথম হিজরত অব্যাহত ছিল। উন্নতির যুগ তাঁর ঈমান আনার অনেক পর শুরু হয়েছে, কিন্তু এরপরও যে মর্যাদা হযরত আবু বকর (রা.) সূচনালগ্নে ঈমান আনার ফলে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কুরবানী করার সুযোগ পাওয়ার কারণে লাভ করেছেন, হযরত উমর (রা.) তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি। আর একারণেই একবার হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি (সা.) বলেন, তোমরা যখন ইসলামকে অস্বীকার করছিলে সেসময় আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর তোমরা যখন ইসলামের বিরোধিতা করছিলে তখন সে ইসলামের সাহায্য করেছে। এখন তোমরা কেন তাকে কষ্ট দিচ্ছ? অতএব, সর্বাগ্রে তাঁর ঈমান আনয়ন এবং ত্যাগ স্বীকারের কথা মহানবী (স.) উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত উমর (রা.)-ও অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন এবং অনেক কুরবানীও করেছিলেন। অএতব, হযরত আবু বকর এই শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছিলেন। কেউ কি বলতে পারবে যে, হযরত আবু বকর (রা.) আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, হায়! মক্কা বিজয়ের সময় যদি ঈমান আনার সুযোগ হতো? বরং সমগ্র পৃথিবীর রাজত্বও যদি তাঁর সামনে রেখে দেয়া হতো তাহলে হযরত আবু বকর সেটিকেও খুবই নগণ্য প্রতিদান আখ্যায়িত করতেন এবং গ্রহণ করতেন না। বরং তিনি এ মর্যাদার বিনিময়ে পৃথিবীর রাজত্বকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়ার কষ্টটুকু করতেও প্রবৃত্ত হতেন না।

অতএব, এগুলো তাঁর কুরবানীরই পুরস্কার ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই পর্যায়ক্রমে পুরস্কার দিয়ে থাকেন। দাসমুক্ত করা সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত উমর (রা.) বলতেন,

أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا يعني بلالا অর্থাৎ আবু বকর আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতাকে মুক্ত করেছেন; এদ্বারা তিনি হযরত বেলালকে বুঝিয়েছেন। হযরত আবু বকর ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিজ সম্পদ ব্যয় করে সাতজন দাসকে মুক্ত করিয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্র জন্য কষ্ট দেয়া হতো। এসব দাসের নাম হলো, হযরত বেলাল (রা.), আমের বিন ফুহায়রা (রা.), যিন্নিরা (রা.), নাহদিয়া (রা.) এবং তার কন্যা, বনী মুয়াম্মালের এক ক্রীতদাসী এবং উম্মে উয়ায়েস।

বিরোধীরাও হযরত আবু বকরের পুণ্য এবং উন্নত চরিত্রের কথা স্বীকার করত। যেমন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন,

আবু বকর (রা.)'র ন্যায় মানুষ, সমগ্র মক্কা যাঁর অনুগ্রহের কাছে ঋণী ছিল, যা কিছু উপার্জন করতেন তা দাসমুক্তির জন্য ব্যয় করে ফেলতেন। একবার তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে একজন নেতার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! তুমি কোথায় যাচ্ছ? জবাবে তিনি বলেন, এ শহরে এখন আমার নিরাপত্তা নেই, এজন্য আমি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। তখন সেই নেতা বলে, তোমার মত পুণ্যবান মানুষ যদি শহর থেকে চলে যায় তাহলে শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি, তুমি শহর ছেড়ে যেও না। তিনি

সেই নেতার আশ্রয়ে শহরে ফিরে আসেন। তিনি যখন ভোরে উঠতেন এবং কুরআন পড়তেন, তখন নারী ও শিশুরা দেয়ালে কান লাগিয়ে কুরআন শুনত। কেননা, তাঁর কণ্ঠে ছিল গভীর আবেগ, আর তা ছিল হৃদয় নিঙড়ানো ও বেদনাবিধুর। পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবিতে ছিল তাই প্রত্যেক নারী, পুরুষ ও শিশু এর অর্থ বুঝত এবং শ্রবণকারীরা এটি শুনে প্রভাবিত হতো। এ বিষয়টি যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন মক্কায় আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে, এভাবে তো সবাই বিধর্মী হয়ে যাবে। অবশেষে লোকেরা সেই নেতার কাছে যায় এবং তাকে বলে, তুমি কেন তাকে তোমার আশ্রয়ে রেখেছ? সেই নেতা তাঁকে এসে বলে, আপনি এভাবে কুরআন পাঠ করবেন না, মক্কার লোকেরা এতে অসন্তুষ্ট হয়। হযরত আবু বকর বলেন, আপনি আপনার আশ্রয় ফিরিয়ে নিন; আমি তো এথেকে বিরত হতে পারব না! সুতরাং সেই নেতা তার আশ্রয় ফিরিয়ে নেয়। এটি হযরত আবু বকর (রা.)'র তাকওয়া ও পবিত্রতার কত শক্তিশালী প্রমাণ যে, যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরম শত্রু ছিল এবং তাঁকে গালিও দিত, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র পবিত্রতায় তাদের এত আস্থা ছিল যে সেই নেতা বলে, তিনি চলে গেলে শহর ধ্বংস হয়ে যাবে।

নামাযের ইমামতির বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (স.)-এর অনুপস্থিতিতে যে ক'জন ব্যক্তি মসজিদে নববীতে নামায পড়ানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর অন্যতম। হযরত আবু বকর (রা.)'র একটি বিশেষ সৌভাগ্য হলো, তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী নামায পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, ঐসকল লোক যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) থাকবেন, তাদের জন্য যথাযথ হবে না তিনি (তথা হযরত আবু বকর) ব্যতিরেকে অন্য কেউ তাদের (নামাযের) ইমামতি করবে। আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে ছিলাম। সেসময় আমরা নিয়মিত নামায আদায় এবং নামাযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন সেই রোগে আক্রান্ত হলেন যে রোগের কারণে তাঁর (সা.) মৃত্যু হয়েছিল, সেসময় নামাযের সময় হলে আযান দেয়া হয়; তিনি (সা.) বলেন, আবু বকর (রা.)-কে বল, তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করা হয় যে, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী; তিনি যখন আপনার স্থলে দাঁড়াবেন তখন তিনি (রা.) লোকদের নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি (সা.) পুনরায় (একই কথা) বলেন। পুনরায় তাঁকে (সা.) নিবেদন করা হয় যে, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি (সা.) তৃতীয়বারে গিয়ে বলেন, তোমরা ইউসুফের যুগের মহিলাদের ন্যায়, অর্থাৎ তাদের ন্যায় কথা বলছ। আবু বকরকে বল, তিনি যেন নামায পড়ান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হন। মহানবী (সা.) কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে তিনি (সা.) বের হন এবং তাঁকে দু'পাশে দু'ব্যক্তির মাধ্যমে (হাঁটতে) সাহায্য করা হচ্ছিল; (অর্থাৎ তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে যান।) তিনি (রা.) বলেন, উক্ত দৃশ্য আমার এখনও এত স্পষ্টভাবে স্মরণ আছে যেন আমি

এখনও তা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর (সা.) পদযুগল অসুস্থতার কারণে মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল; অর্থাৎ তিনি (সা.) ঠিকভাবে হাঁটতে পারছিলেন না, পা তুলতে পারছিলেন না, তাই পা মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-কে এভাবে আসতে দেখলেন তখন তিনি (রা.) পেছনে সরে যেতে চাইলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) ইঙ্গিতে বললেন, নিজ জায়গাতেই অবস্থান করুন। এরপর মহানবী (সা.)-কে আনা হয় এবং তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র পাশে বসে পড়েন। আ'মাশ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, মহানবী (সা.)-ই কি নামায পড়াচ্ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) নামাযের অনুকরণে নামায আদায় করছিলেন এবং লোকেরা কি হযরত আবু বকর (রা.)'র অনুকরণে নামায আদায় করছিল? এর উত্তরে তিনি (অর্থাৎ হযরত আ'মাশ) মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র বাম পাশে বসেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, হযরত আনাস বিন মালেক আনসারী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর আনুসরণ করেন আর তাঁর সেবা করেন এবং তাঁর সংস্পর্শে থাকেন। এরপর তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাদের নামায পড়াতেন। মহানবী (সা.)-এর সেই অসুস্থতা যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়, সোমবার এসে তিনি নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) কামরার পর্দা ওঠালেন। তিনি (সা.) আমাদেরকে দেখছিলেন এবং তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর (সা.) চেহারা মোবারক সাক্ষাৎ পবিত্র কুরআনের পাতা। এরপর তিনি (সা.) আনন্দিত হয়ে মুচকি হাসেন আর আমাদের মনে হলো যে, আমরা আনন্দের কারণে মহানবী (সা.)-কে দেখার ফলে পরীক্ষায় পড়েছি। ইতোমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) নিজ গোড়ালির ওপর ভর করে পেছনে চলে আসেন যেন তিনি কাতারে যোগ দিতে পারেন এবং তিনি ভাবলেন যে, মহানবী (সা.) নামাযের উদ্দেশ্যে বাইরে আসছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) ইশারায় বললেন, নিজেদের নামায পূর্ণ করো, একথা বলে পর্দা নামিয়ে দিলেন এবং সেদিনই তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, একদা সেই দিনগুলোতেই হযরত উমর (রা.) নামায পড়িয়েছিলেন। এর বিস্তারিত হলোঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যাম'আ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর রোগ যখন চরম ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং আমি মুসলমানদের এক জামা'তে তাঁর (সা.) কাছে উপস্থিত ছিলাম। হযরত বেলাল (রা.) তাঁকে নামাযের উদ্দেশ্যে ডাকেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, কাউকে বল, সে যেন লোকদের নামায পড়ায়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যাম'আ বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, হযরত উমর (রা.) লোকদের মাঝে উপস্থিত আছেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থিত নেই। তিনি (রা.) বলেন, হে উমর, উঠুন এবং লোকদের নামায পড়ান। তিনি অগ্রসর হলেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন। হযরত উমর (রা.) এর কণ্ঠস্বর উঁচু ছিল; মহানবী (সা.) যখন তার কণ্ঠস্বর শুনলেন তখন তিনি (সা.) বললেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ্ একে অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও। তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি (রা.) আসলেন। হযরত উমর

(রা.)’র নামায পড়িয়ে দেবার পরও তিনি (রা.) লোকদের নামায পড়ান। এটিও এক বর্ণনায় বিদ্যমান।

আরো একটি রেওয়ায়েত দেখা যায়, হযরত উমর (রা.)’র কণ্ঠস্বর শোনার পর মহানবী (সা.) বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি (সা.) নিজ কামরা হতে মাথা বের করে দেখে বললেন, না, না, না! ইবনে আবি কুহাফার উচিৎ তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হয়ে একথা বললেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এভাবে রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) যখন বিষয়টি জানতে পারলেন তখন তিনি (রা.) আব্দুল্লাহ বিন যাম’আকে, যিনি তাকে নামায পড়াতে বলেছিলেন, তাকে গিয়ে বলেন, আমি তো মনে করেছিলাম, মহানবী (সা.) আমাকে নামায পড়াতে তোমাকে বলতে বলেছেন। নতুবা আমি কখোনই নামায পড়াতাম না। আব্দুল্লাহ বিন যাম’আ (রা.) তখন বলেন, না, আমি যখন দেখলাম হযরত আবু বকর (রা.)-কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তখন আমি নিজেই মনে করলাম, তাঁর (রা.) পর আপনিই নামায পড়ানোর যোগ্য, এজন্য আমি আপনাকে নামায পড়াতে অনুরোধ করেছি; আমাকে সরাসরি এমনটি করতে বলা হয় নি। এটি মুসনাদ আহমদের রেওয়ায়েত।

সন্তানদের প্রতি তাঁর (রা.) মায়া-মমতা সম্পর্কে লেখকরা লিখেছেন। একজন লেখক লিখেন, সন্তানদের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)’র অগাধ ভালোবাসা ছিল। নিজ কথা ও কর্মে তিনি (রা.) তা প্রকাশও করতেন। তাঁর (রা.) বড় পুত্র হযরত আব্দুর রহমান পৃথক বাসায় থাকতেন। কিন্তু তার ঘর চালানোর ব্যয়ভার হযরত আবু বকর (রা.) নিজেই নিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর (রা.) বড় কন্যা হযরত আসমা (রা.)’র বিবাহ হযরত যুবায়ের ইবনুল আওওয়াম (রা.)’র সাথে হয়েছিল। শুরুর দিকে তিনি অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় ছিলেন, বাসায় কোনো সেবক বা সেবিকা রাখার সামর্থ্য ছিল না। এজন্য হযরত আসমা (রা.)-কে অনেক কাজ করতে হতো। তিনি (রা.) আটার খামির করতেন, খাবার রান্না করতেন, পানি আনতেন, থলে সেলাই করতেন এবং বহু দূর থেকে খেজুরের বীজ মাথায় করে আনতেন, এমনকি ঘোড়াকে ঘাসও দিতেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এসব জানতে পারলেন তখন তিনি একজন সেবক পাঠান, যে ঘোড়াকে ঘাস দিত এবং সেগুলোর দেখাশোনা করতো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, একজন সেবক পাঠিয়ে পিতা আমাকে যেন স্বাধীন করে দিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) তার স্ত্রী আতেকাকে ভালোবাসতেন। একটি ঘটনা লেখা আছে যে, তার কারণে তিনি জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) এটি সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্‌কে আদেশ দেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কারণে জিহাদে যাওয়া পরিত্যাগ করেছ, তাই তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও! তিনি আদেশ পালনার্থে তাকে তালাক দেন, কিন্তু আতেকার বিরহে তিনি বেদনাতুর কবিতা আবৃত্তি করেন। হযরত আবু বকর (রা.)’র কানে যখন এসব পঙক্তি পৌঁছায় তখন তাঁর মন গলে এবং তিনি (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্‌কে নিজ স্ত্রী ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি দেন।

হযরত বারা’ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)’র সাথে একবার আমি তাঁর পরিবারের কাছে যাই। দেখি তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) শুয়ে আছেন। তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আয়েশা (রা.)’র গালে চুমু দিলেন এবং বললেন, **মা, কেমন আছ?** ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও এ বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা করা হবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)